শহীদ ড. আব্দুল্লাহ আযযাম রহ

আসবাহ আল হারতিয়া।ফিলিস্তিনের জেনিন প্রদেশের একটি ঐতিহ্যবাহি গ্রাম। যুগ যুগ ধরে ইতিহাসের পাতায় এই গ্রামের নাম স্বর্নাক্ষরে লিপিবদ্ধ।কারন এ গ্রাম জন্ম দিয়েছে বহু মহামানবকে।বহু মুজাহিদ আর সমরবিদকে।বহু দার্শনিক আর চিন্তাবিদকে বহু সাহিত্যিক আর ভাষাবিদকে।

১৯৪১ সাল। আসবাহ আল হারতিয়া তখন পরাধীন।ইহুদীদের পদভারে রক্তাক্ত।তার দুরন্ত বায়ুর বুকে সন্তান হারা মায়ের আহাজারি। এতীম শিশুদের আর্তচিৎকার। অসহায় বৃদ্ধ আর বৃদ্ধাদের চোখে চোখে অশ্রুর বান। কৌমার্যছিন্ন যুবতী আর তরুণীদের চোখে প্রতিশোধের লেলিহান আগুন। ঠিক তখন আসবাহ আল হারতিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন এক নবজাত সন্তান।যার নাম আব্দুল্লাহ ইউসুফ আযযাম। পারিবারিক ঐতিহ্যে লালিত হন ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসে। মহব্বত করতে শিখেন আল্লাহ ও তাঁর রাসুল্কে;আল্লাহর পথে জিহাদ রত বীরদের কে; সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিদেরকে। আখিরাতের চিন্তা-ফিকির আর শাহাদাতের তামান্না শৈশব থেকেই তাঁর চরিত্রে ফুটে উঠতে থাকে।

আব্দুল্লাহ আযযাম এক ব্যতিক্রমধর্মী কিশোর। সদা গম্ভীর, নিষ্ঠাবান, চিন্তায় ডুবে থাকা এক কিশোর। নিয়মানুবর্তিতা, সময়নুবর্তিতা তাঁর চরিত্রকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলেছে। অল্প বয়সেই তিনি ইসলামের দাওয়াতের কাজ শুরু করেন। ইসলামী চিন্তা-চেতনাকে মুসলমানদের মাঝে জাগ্রত করতে পেরেশান হয়ে পরেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠরত অবস্থায়ই তাঁর অসাধারন গুণাবলী দেখে শিক্ষকরা হতবাক হয়ে যান। তারা ভাবতে থাকেন,আমাদের এ সন্তান কালের ব্যবধানে নিশ্চয় বড় কিছু হবে। হয়তো আল্লাহ তার দ্বারা ইসলামের সংস্কারের কাজ করিয়ে নেবেন। সুনামের সাথেই তিনি লেখাপড়া করতে থাকেন। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের লেখাপড়া সুনামের সাথেই শেষ করেন। ক্লাসে সবার চেয়ে ছোট হওয়া সত্ত্বেও তিনি সবচেয়ে বেশি সুদর্শন ও মেধাবী ছিলেন।এরপর তিনি এগ্রিকালচারাল কাদরী কলেজে ভর্তি হন এবং সেখান থেকেই

ডিপ্লোমা ডিগ্রি লাভ করেন।

এরপর তিনি দক্ষিণ জর্দানের আদ্দির নামক গ্রামে শিক্ষকতা পেশায় যোগদান করেন।কিন্তু তার পিপাসার্ত মন তখনো ছিল অস্থির-উতলা। তাই তিনি পরে দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে শরিয়াহ বিভাগে ভর্তি হন এবং ১৯৬৬ সালে শরিয়াহ (ইসলামি আইন)এর উপর বি এ ডিগ্রি লাভ করেন।

১৯৬৭ সাল। ইহুদীরা পশ্চিম তীর দখল করে নিল।রক্তে রঞ্জিত হল পশ্চিমতীর। চোখের সামনে দেখলেন, নির্যাতন আর নিপীড়নের ভয়াল চিত্র। বুক ফাটা আহাজারি, কান্না আর বিলাপের অসহনীয় বেদনা তার হৃদয়কে করে ক্ষত বিক্ষত। তার চোখে জমাট বাধে অশ্রু। তিনি শপথ করলেন, না, আর নয়। ইহুদীদের দখলদারিত্বের অধিনে তিনি আর থাকবেন না। তার পেশীতে প্রতিশোধের আগুন জ্বলে উঠে।চির চেনা শান্ত সমাহিত সেই আযযাম যেন জ্বলন্ত আঙ্গার। তবে অত্যন্ত নিরব এবং ধীর স্থির। দারুন চিন্তাশীল। সময়ের ব্যবধানে হলেও তিনি সফলতার মুখ দেখতে চান।অত্যাচারীর হাত চিরতরে গুরিয়ে দিতে চান।

১৯৭০ সাল। তিনি তখন জর্দানে। ইসরাঈলী আগ্রাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে তিনি জিহাদে যোগ দিলেন। শুরু হল তার জীবনের আরেক অধ্যায়। চিন্তায় লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়নের পথে দৃঢ়পদে এগিয়ে চললেন। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর তিনি অনুভব করলেন তাকে আরও পড়তে হবে। তাকে শিখতে হবে। ইসলামের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখে অল্প বিদ্যা নিয়ে সামনে চলা বড়ই কঠিন এবং অত্যন্ত দুষ্কর। তাই তিনি চলে এলেন মিসরে। ভর্তি হলেন আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে। এবার তিনি ইসলামী আইন শাস্ত্রে মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করলেন। ১৯৭১ সালে আল আযহার বিশ্ব বিদ্যালয় থেকে পাণ্ডিত্যের পুরস্কার লাভ করেন। সে বছরই তিনি ইসলামি আইনের বিজ্ঞান ও দর্শন (উসুলুল ফিকহ) এর উপর পি এইচ ডি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৭৩ সালে মিশরে অবস্থানকালে শহীদ সাইয়্যেদ কুতুব রহ.'র (১৯০৬-১৯৬৬) পরিবারের খোজ খবর নিতে যান।

শহীদ শেইখ আব্দুল্লাহ আযযাম দেড় বছর ফিলিস্থিনের জিহাদে অতিবাহিত করেন। অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে জিহাদের কার্যক্রম চালিয়ে যান। কিন্তু এ সময় তিনি মানসিকভাবে প্রশান্ত ছিলেন না। কারন তিনি দেখতেন, যারা ফিলিস্তিনের জিহাদে রত তাদের অনেকেই ইসলাম থেকে দূরে সরে আছে। মাঝে মধ্যেই তিনি দুঃখ করে বলতেন, ফিলিস্তিনকে মুক্ত করার জন্য এটা কোন ধরনের জিহাদ হচ্ছে, যেখানে মুজাহিদ ভাইয়েরা প্লেইং কার্ড, গান শোনা আর টেলিভিশনের অশ্লিল ছবি দেখে রাত কাটিয়ে দিচ্ছে! তিনি দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলতেন,হাজারো মানুষের জনবহুল জায়গায় সালাতের জন্যে আহবান করা হলে একেবারেই অল্পসংখ্যক লোক উপস্থিত হয় যাদের

হাতের আঙ্গুলী দিয়ে গোনা সম্ভব, এদের দিয়ে কী জিহাদ হবে! তাই তিনি তাদেরকে ইসলামের পথে পরিচালিত করতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু তারা তাকে প্রতিহত করত।বাধা দিত। একদিন তিনি এক মুজাহিদকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, ফিলিস্তিনের এই যুদ্ধের সাথে কি দ্বীনের কোন সম্পর্ক আছে? তখন সেই মুজাহিদ অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় বলল, এই যুদ্ধের সাথে দ্বীন ইসলামের কোনই সম্পর্ক নেই।

এ কথা শোনার পর ড. শেখ আব্দুল্লাহ আযযামের মন ভেঙ্গে যায়। তিনি ফিলিস্থিনের রনাঙ্গন তখনই ত্যাগ করেন। এবং ফিলিস্থিন ত্যাগ করে তিনি তখন সৌদি আরবে চলে আসেন। জেদ্দায় অবস্থিত বাদশাহ আব্দুল আজীজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের মাঝে ইসলামের নির্মল দেতনা ও জিহাদী জযবা সৃষ্টির লক্ষ্যে সেখানে পাঠদানের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি তখন উপলব্ধি করেন,যে মুসলিম উম্মাহর বজয় ফিরিয়ে আনতে পারে ঐক্যবদ্ধ সশস্ত্র বাহিনী। এ ছাড়া বিজয় সম্ভব নয়। তখন থেকে জিহাদ আর বন্দুক হয়ে যায় তার প্রধান কাজ আর বিনোদন সঙ্গি। তিনি অত্যন্ত জোড়ালো ভাষায় ঘোষণা করতে থাকেন,আর কোন সমঝোতা নয়, আর নয় আলাপ আলোচনা। জিহাদ আর রাইফেলই হবে সমাধানের একমাত্র পথ। মসলমানদের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনার একমাত্র রাস্তা।

১৯৮০ সাল। হজ্জে এসেছেন এক আফগান মুজাহিদ। সহসা তার সাথে দেখা হয়ে যায় শেইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ.’র।কথার তালে তালে সখ্যতা বৃদ্ধি পেল। তার কাছ থেকে একের পর এক শুনলেন আফগান জিহাদের অবিশ্যাস্য কাহিনী। মুজাহিদদের ত্যাগ, কুরবানী আর আল্লাহর মদদের কাহিনী শুনতে শুনতে শেইখ আব্দুল্লাহ আযযাম অভিভূত হয়ে যান। তিনি বুঝতে পারেন, এতোদিন ধরে তিনি এ পথটিই খুজে ফিরছিলেন।এরই খোজ করছিলেন তিনি।এরপর থেকেই তার মন অস্থির হয়ে ওঠে।অশান্ত হয়ে ওঠে।তিনি বাদশা আব্দুল আজীজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা পেশা ত্যাগ করে পাকিস্তানের ইসলামাবাদে চলে আসেন। শুরুতে তিনি ইসলামাবাদে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন। ইতোমধ্যে বেশ কিছু আফগান মুজাহিদ নেতার সাথে সখ্যতা গড়ে ওঠে। তখন আফগান জিহাদ সম্পর্কে তিনি বাস্তব তথ্য সংগ্রহ করেন। নানা বিষয়ে খোজ খবর নেন। চলমান জিহাদের রূপরেখা অনুধাবন করেন। তারপর বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে পুরোপুরিভাবে আফগান জিহাদে আত্মনিয়োগ করেন।হ্রিদয়-মন,মেধা-যোগ্যতা, অর্থ-সম্পদ সবকিছু অকাতরে উজাড় করে দান করেন আল্লাহর রাস্তায়। সেই সুয় শাইখ আব্দুল্লাহ আযযামের কণ্ঠ চিরে বার বার রাসুলের এই বাণীটি মুজাহিদদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ত, “আল্লাহর পথে জিহাদের ময়দানে এক মূহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকা ষাট বছর ইবাদতে দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে উত্তম।” তারপর তা তাদের হৃদয়ে ছুয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করত। শাহাদাতের আশায় তাদের অস্থির করে ছাড়ত। তারা ব্যকুল হয়ে যেত জান্নাতে সবুজ পাখি হয়ে উড়ে বেরানোর জন্যে।

আব্দুল্লাহ আযযাম ও তার প্রিয় শিষ্য উসামা বিন লাদেন পেশোয়ারে অবস্থানকালে মুজাহিদদের সেবা সংস্থা বায়তুল আনসারে যোগ দেন। এ সংস্থা আফগান মুজাহিদদের সব ধরনের সাহায্য সহযোগিতা করত। নতুন মুজাহিদদের পাকিস্তানে প্রশিক্ষণ দিয়ে আফগানিস্থানে সম্মুখ যুদ্ধে প্রেরণ করত। ইতোমধ্যে তিনি তার পরিবারকেও নিয়ে আসেন।

এরপর আব্দুল্লাহ আযযাম আরো সামনে আগ্রসর হলেন। জিহাদের প্রথম কাতারে গিয়ে শামিল হলেন। হাতে তুলে নিলের অস্ত্র।ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়লেন সম্মুখ লড়াইয়ে। অসম্ভব সাহসিকতায় বীরের মত যুদ্ধ করতে লাগলেন।আল্লাহর রাহে জীবন দেয়ার জন্য তিনি উতলা হয়ে উঠলেন। ছুটে চললেন এক ফ্রন্ট থেকে আরেক ফ্রন্টে। এক রনক্ষেত্র থেকে আরেক রনক্ষেত্রে। আহ! এ যেন আরেক জীবন।এ জীবনের কোন মৃত্যু নেই। এর স্বাদ, রঙ, রূপ আর প্রক্রিতি একেবারেই আলাদা। তিনি আফগানিস্তানের অধিকাংশ প্রদেশে ছুটে গেলেন। লোগার, কান্দাহার, হিন্দুকুশ পর্বতমালা, পাঞ্জশির উপত্যকা, কাবুল আর জালালাবাদে ছুটে চললেন বিরামহীন গতিতে। ফলে আফগান রনাঙ্গনের সাধারণ যোদ্ধা ও মুজাহিদদের সাথে তার পরিচয় হয়। সখ্যতা গড়ে ওঠে। বন্ধুত্ব হয়। সবাই তাকে তার হৃদয়ের উদারতা, জিহাদি জযবা,আল্লাহর রাহে জীবন দেয়ার আকুতি মুসলিম উম্মাহর দরদী ব্যক্তিত্ব্যের কারনে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসতে থাকে।মহব্বত করতে থাকে।

এরপর তিনি আবার ফিরে আসেন পেশোয়ারে। বাস্তব অভিজ্ঞতায় তিনি এবার পরিপূর্ণ। গোটা আফগান রনাঙ্গনের সমস্যা-সমাধান তার মস্তিষ্কের কোষে কোষে। জিহাদের এই কাফেলাকে সঠিক পথে পরিচালনার ও চুড়ান্ত বিজয়ের পথে নিয়ে যাওয়ার তামান্নায় তিনি অস্থির। তাই মুজাহিদদের মাঝে সংস্কারমূলক বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন। মুজাহিদদের পরিশুদ্ধ করতে লাগলেন। জিহাদের পথে নানা বিভ্রান্তির আলোচনা করতে লাগলেন। বিভক্ত মুজাহিদদের গ্রুপ গুলোকে একই কাতারে নিয়ে আসতে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন । কেঁদে কেঁদে দোয়া করতে লাগলেন। যারা কখনো জিহাদের কাতারে শাম্মিল হয়নি; সম্মুখ লড়াইইয়ে অংশ নেয়নি তাদের প্রথম কাতারে শামিল হওয়ার জন্য উদ্ভুদ্ধ করতে লাগলেন।

আফগান মুজাহিদ নেতার মাঝে তার প্রভাব ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তাই সবাই তাকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসতেন। তার প্রস্তাব, পরিকল্পনাকে কেউ অগ্রাহ্য করতে পারতেন না।

এরপর তিনি মুসলিম উম্মাহকে আফগান জিহাদের ব্যপারে জাগ্রত করার দিকে মনোনিবেশ করেন। আফগান জিহাদের পবিত্র আহবানকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে ছুটে যান বিশ্বের বহু দেশে।সাক্ষাৎ করেন সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে অগ্নিঝরা বক্তৃতা দিতে

থাকেন। চারদিকে ছুটতে থাকে অনল প্রবাহ। তিনি দ্বীনের হেফাজতের জন্য, শত্রুদের হাত থেকে মুসলমানদের লুণ্ঠিত ভূমিকে উদ্ধারের জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। ফাকে ফাকে তার কলমও ছুটতে থাকে।তিনি জিহাদের বিষয়ে বেশ কয়েকটি পুস্তকও রচনা করেন। যা এখনও পাঠককে আন্দোলিত করে। আলোড়িত করে।জিহাদের পথে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করে। পুস্তকগুলোর শীর্ষে রয়েছে- এসো কাফেলাবদ্ধ হই, আফগান জিহাদে রহমানের নিদর্শন সমূহ, মুসলিম ভূমিসমূহের প্রতিরক্ষা, রারা জান্নাতের কুমারীদের ভালোবাসে ইত্যাদি।

শহীদ শেইখ আব্দুল্লহা আযযামের আবিরাম প্রচেষ্টা, মেহনত-মুজাহাদা সফলতার আলো দেখতে পায়। তিনি বিশ্বের মুসলমানদেরকে আফগান জিহাদের ব্যপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে সক্ষম হন । এর ফলে আফগান জিহাদ শুধু আফগান জনতার মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং তা অন্তর্জাতিক রূপ লাভ করে এবং বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মুসলমানরা আফগান জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে ছুটে আসতে থাকে। তারা ইহুদী-খ্রিস্টান্দের হাতে নিপীড়িত-নির্যাতিত মুসলিম মা-বোনদের উদ্ধারে শপথ গ্রহণ করতে থাকে এবং প্রত্যেক লড়াইয়ে অংগ্রহণ করে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে থাকে।

তিনি তার মানসপটে একটি চিত্রই একেছিলেন। আর তা হল, জিহাদের মাধ্যমে ইসলামি খিলাফতের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা। তিনি বিশ্বাস করতে এবং বার বার বলতেন, পৃথিবীর বুকে খিলাফাত প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে। তাই তিনি বহুবার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার প্রস্তাবকে অকুণ্ঠচিত্তে প্রত্যাখ্যান করেছেন আর দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, তিনি ততক্ষন পর্যন্ত জিহাদ চালিয়ে যাবেন যতক্ষন পর্যন্ত হয় তিনি বিজয়ী হবেন নতুবা তাকে হত্যা করা হবে।

আফগান রণাঙ্গন ছিল তার স্বপ্নের চারণভূমি। তাই তিনি বলতেন আমি কখনো জিহাদের ভূমি পরিত্যাগ করব না, তিনটি অবস্থা ছাড়া। হয় আমি আফগানিস্তানে নিহত হব, নতুবা পেশোয়ারে নিহত হব, নতুবা হাত বাধা অবস্থায় আমাকে পাকিস্তান থেকে বহিস্কার করা হবে।

একদিন মিম্বারে খুতবা দানকালে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বললেন, আমি মনে করি আমার প্রকৃত বয়স হচ্ছে নয় বছর। সাড়ে সাত বছর কেটেছে আফগান জিহাদে আর দেড় বছর কেটেছে ফিলিস্তিনের জিহাদে। এছাড়া আমার জীবনের বাকি সময়গুলোর কোন মূল্য আমার কাছে নেই।

তিনি আরো বললেন, জিহাদ পরিত্যাগ করা হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না এক আল্লাহর ইবাদত করাহবে। এ জিহাদ চলতে থাকবে যতক্ষন পর্যন্ত না আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করা হবে। জিহাদ চলতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সব নির্যাতিত মানুষকে মুক্ত করা হবে।

জিহাদ চলতে থাকবে যতক্ষন পর্যন্ত না আমাদের সম্মান ও লুণ্ঠিত ভূমিগুলো ফিরিয়ে আনা হবে। জিহাদ হল চিরস্থায়ি মর্যাদার পথ।

শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম মুসলিম উম্মাহকে লক্ষ্য করে জুমআর খুতবায় বলতেন, মুসলিম জাতি কখনো অন্য জাতি দ্বারা পরাজিত হয়নি। আমরা মুসলমানরা কখনো আমাদের শত্রুর কাছে পরাজিত হই নি; বরং আমরা আমাদের নিজেদের লোকদের কাছেই পরাজিত হয়েছি।

শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম একজন উত্তম চরিত্রের অধিকারি ব্যক্তি ছিলেন। ধর্মানুরাগ,আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা, সংযমশীলতা ছিল তার চারিত্রিক অলংকার। তিনি কখনো কারো সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করতেন না। তরুণদের তিনি ভিন্ন চোখে দেখতেন। তাদের কথা মনযোগ দিয়ে শুনতেন। সবধরনের ভয়-ভীতি মারিয়ে হৃদয়ের সুপ্ত প্রতিভাকে জাগ্রত করতে উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি নিয়মিত সিয়াম পালন করতেন। বিশেষ করে দাউদ আ.'এর সুন্নাহ অনুযায়ী অর্থাৎ একদিন সিয়াম পালন করতে একদিন বিরত থাকতেন। এভাবে তিনি সারা বছর সিয়াম পালন করতেন। বিশেষ করে সোমবার ও বৃহস্পতিবার তিনি সিয়াম পালন করতেন এবং অন্যদেরও এ দু'দিন সিয়াম পালন করতে উতসাহিত করতেন ।

একদা এক দুঃখজনক ঘটনা ঘটল। পেশোয়ারে কিছু উগ্র স্বভাবের লোক ঘোষণা দিল, শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম কাফের হয়ে গেছে, কারন তিনি মুসলমানদের সম্পদ অপচয় করছেন।

শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম এ সংবাদ শুনে বিস্মিত হলেন না।ক্ষিপ্তও হলেন না। তাদের সাথে কোন রুঢ় আচরণও করলেন না; বরং তাদের জন্য কিছু উপহার সমগ্রি পাঠিয়ে দিলেন। এরপরও কিছু লোক বিরত হল না। তারা তার বিরুদ্ধে কটু কথা বলতে লাগল।অপবাদ ছড়াতে লাগল। শাইখ আযযাম র. তখনও কিছু বললেন না। বরং নিয়মিত তাদের নিকট উপহার সামগ্রী পাঠাতে লাগলেন। তারপর একসময় তাদের ভুল ভাঙল। তখন তারা বলতে লাগল,আল্লাহর কসম! আমরা কখনোই শাইখ আব্দুল্লাহ আযযামের মত মানুষ দেখিনি। তিনি আমাদের নিয়মিত অর্থ ও উপহার সামগ্রী দিয়ে যেত অথচ আমরা তার বিরুদ্ধে কটু কথা বলতাম।

শাইখ আব্দুল্লাহ আযযামের চেষ্টার ফলে আফগানিস্থানের বেশ কয়েকটি মুজাহিদ গ্রুপ একত্রিত হল। তারা একই আমীরের নির্দেশে চলতে লাগল, ফলে শত্রুদের মাঝে ভীতি ছড়িয়ে পড়ল। মুজাহিদরা প্রত্যেক ফ্রন্টে বিজয়মাল্য ছিনিয়ে আনতে লাগল।এ অবস্থায় শত্রুরা তাকে সহ্য করতে পারল না। তারা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করল। তাকে হত্যার কৌশল খুজতে লাগল।

পেশোয়ারে তিনি এক মসজিদে নিয়মিত জুমার নামায পড়াতেন। নামাযের আগে অগ্নিঝরা বক্তৃতা দিতেন। দূরদুরান্ত থেকে বহু মানুষ তার বক্তৃতা শুনতে ছুটে আসত। ১৯৮৯ সালে শত্রুরা তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে তার মিম্বারের নিচে একটি শক্তিশালি টিএনটি বিস্ফোরক রেখে দিল। এটা এতোই ভয়াবহ ছিল যে তা বিস্ফোরিত হলে পুরো মসজিদটি ধ্বসে পরত।মসজিদের কেউ জীবিত থাকত না। কিন্তু আল্লাহর ফয়সালা ছিল ভিন্ন। তাই সেই বিস্ফোরকটি আল্লাহর হুকুমে আর বিস্ফোরিত হয়নি।

এ দিকে শত্রুরা ষড়যন্ত্র চালিয়ে যেতে লাগলো । ১৯৮৯ সালের ২৪ শে নভেম্বর। শুক্রবার। শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম যে পথ দিয়ে জুমআর নামায আদায় করতে যেতেন সে পথে শত্রুরা তিনটি বোমা পুতে রাখল।রাস্তাটি ছিল সরু।একটির বেশি গাড়ি তা দিয়ে অতিক্রম করতে পারত না। দুপুর ১২.৩০ মিনিটে শাইখের গাড়িটি ঠিক বোমা যেখানে পুতে রাখা হয়েছিল সেখানে এসে বন্ধ হয়ে গেল। সে গাড়িতে ছিলেন শাইখ ও তার দুই ছেলে ইবরাহীম ও মুহাম্মাদ। আর তাদের সাথে ছিলেন তার বন্ধু তামিম আল আদনানির এক পুত্র। গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে না দেখে শাইখ গাড়ি থেকে নেমে হাটা শুরু করলেন। আর তখনই বিকট শব্দ করে শত্রুদের পুতে রাখা বোমা বিস্ফোরিত হল। বিস্ফোরণের ভয়াবহ আওয়াজে কেপে উঠল পুরো শহর। আতঙ্ক ছড়িয়ে পরল সর্বত্র। তারপরই মসজিদ ও আশপাশের মানুষরা দৌড়ে এল। তারা ছুটে এসে গাড়ির বিক্ষিপ্ত টুকরো ছাড়া আর কিছুই পেলনা। বিস্ফোরনের ফলে শাইখের দুই ছেলের দেহ ১০০ মিটার উপরে উঠে গিয়েছিল। তাদের দেহ বিভিন্ন গাছের ডালে বৈদ্যুতিক তারের সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গেল।কিন্তু আল্লাহ তা'আলা শহীদ শাইখ আব্দুল্লাহ আযযামের দেহকে রক্ষা করলেন।দেহটি সম্পূরণ অক্ষত অবস্থায় একটি দেয়ালের সাথে হেলান দেয়া অবস্থায় পাওয়া গেল। তখন তার মুখ দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল।

তার শাহাদাতের সংবাদে চারিদিকে শোকের ছায়া নেমে এলো। কান্নার রোল পড়ে গেল । মুজাহিদদের শিবিরে শিবিরে সে কান্না ছড়িয়ে পরল।স্তব্ধ হয়ে গেল তার নিকট তম ব্যক্তিরা। এই ভাবে দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে নিজের জীবন বিলিয়ে দিলেন তিনি । আল্লাহ তার এই ত্যাগকে কবুল করুক।আমিন।

শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. সম্পর্কে কতিপয় মন্তব্যঃ

১.শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম একক কোন ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি একাই ছিলেন একটি উম্মাহ। একটি জাতি। তার শাহাদাতের পর মুসলিম মায়েরা তার মতো দ্বিতীয় আরেক সন্তান জন্ম দিতে পারে নি।

[১৯৯৯ সালে আল জাজিরা টেলিভিশন চ্যানেলে শাইখ উসামা বিন লাদেনের এক সাক্ষাতকার প্রচারিত হয়। শাইখ উসামা সেই সাক্ষাৎকারে শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ.সম্পর্কে উপরের উক্তিটি করেন] ২. বিংশ শতাব্দিতে জিহাদকে পুনঃ জাগরণে তিনিই

(শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম র.) দায়ী।

[টাইম ম্যাগাজিন] ৩. ১৯৮০ এর দশকে শহীদ শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম ছিলেন এমন একটি মুদ্রিত নাম যার কথা চেচনিয়ার জিহাদের ময়দানগুলোতে আজও বার বার প্রতিধ্বনিত হয়ে চলছে।তিনি (আব্দুল্লাহ আযযাম) মুজাহিদীনদের ব্যপারে বলতেন, যে কেউ জিহাদের ময়দানে মারা গেল সে যেন শরীক হল শহীদী কাফেলার সাথে।

[চেচনিয়া জিহাদের ফিল্ড কমান্ডার ইবনুল খাত্তাব রহ.] ৪. তার কথা সাধারণ মানুষের মত ছিল না, তিনি স্বল্পভাষী ছিলেন কিন্তু তার কথার গভীরতা ছিল অসীম। যখন আপনি তার দিকে তাকাবেন,আপনার হৃদয় ইমানে এবং আল্লাহর ভালোবাসায় পরিপূর্ন হয়ে যাবে। [মক্কার জনৈক মুজাহিদ শাইখ]

সম্পাদনা : আবু সাঈদ মুহাম্মাদ উমর